কিশোর রচনা সম্ভার

কিশোর রচনা সম্ভার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সম্পাদনা
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

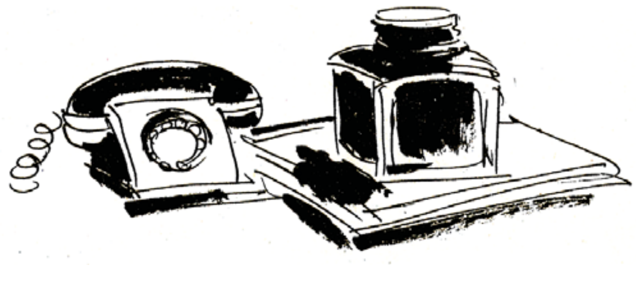

KISHORE RACHANA SAMBHAR HEMENDRA KUMAR ROY
A collection of Writings for the young adults
Edited by Dr. Parthajit Gangopadhyay

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-765-0

Price r 345

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ আর্ট ক্রিয়েশন
অলংকরণ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

দাম r ৩৪৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

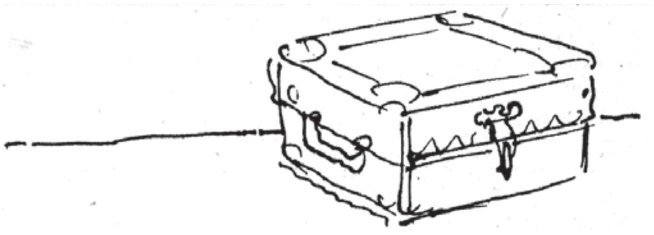

পুনশ্চ সংস্করণের ভূমিকা

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রথম জীবনে যা লিখতেন, সবই ছিল বড়োদের। আগে সাবালকপাঠ্য, পরে বালকপাঠ্য। বড়োদের জন্য কথাসাহিত্যের চর্চা করতেন তিনি। লিখতেন গল্প-উপন্যাস। বেশিরভাগই ছাপা হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির 'ভারতী'তে। সাহিত্যচর্চার প্রথমপর্বে তিনি ছিলেন 'ভারতী'গোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য নিয়মিত লেখক। হেমেন্দ্রকুমারের কালে 'ভারতী'-র সম্পাদনার দায়িত্ব সামলাতেন ঠাকুরবাড়ির জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সেই প্রথম 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সৌরীন্দ্রমোহনের মতো ঠাকুরপরিবার-বহির্ভূত কেউ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী'র যাত্রা শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও সম্পাদনা করেছিলেন কিছুকাল।

'ভারতী'-র পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অজস্র রচনা। বলা-ই বাহুল্য, সেসব লেখা বড়োদের। আজও বড়োদের লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায় আড়ালেই রয়েছেন। ছোটোদের মহলে খ্যাত, অ্যাডভেঞ্চার-গোয়েন্দা গল্পের লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায় বড়োদের লেখা খুব কম লেখেননি। একটি-দু'টি নয়, চার-চারটি উপন্যাস লিখেছিলেন 'ভারতী'তে। 'আলেয়ার আলো', 'কাল-বৈশাখী', 'জলের আল্পনা' ও 'সুচরিতা'—উপন্যাস চারটি প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। গল্প-উপন্যাস শুধু নয়, 'ভারতী'তে রয়েছে হেমেন্দ্রকুমারের কবিতা, অনেকানেক প্রবন্ধ। ধারাবাহিকভাবেও প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধ। কত বিচিত্র, কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। 'মিশরের আর্ট', 'মমির কথা', 'কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল' বা 'মানুষখেকো গাছ'— এইসব রচনা-শিরোনামই বুঝিয়ে দেয়, বিবিধ-বিচিত্র দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। কয়েকটি লেখা অবশ্য স্বনামে লেখেননি। লিখেছিলেন 'প্রসাদদাস রায়' ছদ্মনামে। 'ভারতী'তে দুশোরও বেশি লেখা ছাপা হয়েছিল তাঁর। এ তো শুধু 'ভারতী'র পরিসংখ্যান, সমসাময়িক অন্যান্য সাবালকপাঠ্য পত্র-পত্রিকাতেও আরও কত লেখাই না ছড়িয়ে আছে!

হেমেন্দ্রকুমার রায় বড়োদের জন্য শুধু লেখেননি, পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। 'নাচঘর' বেরিয়েছিল তাঁরই সম্পাদনায়। প্রথমদিকে সঙ্গে ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। পরে তিনিই এককভাবে সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন। নাট্যকলা নিয়ে গভীর চিন্তাপ্রসূত উজ্জ্বল প্রবন্ধমালায় সমৃদ্ধ এমন একটি পরিচ্ছন্ন পত্রিকার প্রকাশ যে সম্ভব, 'নাচঘর' প্রকাশের আগে তা বাঙালি-পাঠক ভাবতেই পারেননি। লিখতেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, ধীরাজকুমার ভট্টাচার্য ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্ব। পণ্ডিতজনের পাশাপাশি বহু মঞ্চ-ব্যক্তিত্বের রচনাসম্ভারও 'নাচঘর'-এ মুদ্রিত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন হেমেন্দ্রকুমারকে। হেমেন্দ্রকুমার শিল্পীগুরুকে নিয়ে বেশ কয়েকটি স্মৃতিকথা লিখেছেন। একাধিক স্মৃতিচর্চায় আছে সেই স্নেহময় সম্পর্কের কথা। অবনীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন 'নাচঘর'-এ। রয়েছে অজস্র অস্বাক্ষরিত রচনা। এগুলি হেমেন্দ্রকুমার রায়েরই লেখা। 'মস্কোর আর্ট থিয়েটার' ও তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আগ্রহ কত দূর বিস্তৃত ছিল, তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। কত মূল্যবান রচনা ধূলিধূসর জীর্ণ পত্র-পত্রিকায় মুখ গুঁজে রয়েছে, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। নাট্যকলা নিয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের চিন্তাধারা শুধু আধুনিক নয়, নিজস্বতার আলোকে

আলোকিত। ‘সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ’ নামে একটি মূল্যবান বইও লিখেছিলেন তিনি। নৃত্য ও চিত্র এই দুটি বিষয়েই তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। নিজে ছবি আঁকতেন, চিত্রশিল্প বিষয়ক তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে পুরোনো পত্র-পত্রিকায়। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীও হেমেন্দ্রকুমারের নৃত্য পারঙ্গমতার ওপর গভীর আস্থা পোষণ করতেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় ‘বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার’ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছিলেন। অবিস্মরণীয় নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমারকে জানার জন্য আজও এ বইটি আমাদের প্রধান অবলম্বন। নাট্যাচার্য তাঁর ‘সীতা’ নাটকের নৃত্য-পরিচালক ও নৃত্য-শিক্ষক হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমারকে। মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। ‘সীতা’ নাটকে হেমেন্দ্রকুমারের লেখা গান ‘অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে’ সে-সময় প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছিল। সব মিলিয়ে হাজারের বেশি গান লিখেছিলেন। অনেক গানের সুরারোপ নিজেই করেছিলেন। কিছু করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। হেমেন্দ্রকুমারের গদ্যসাহিত্যেও ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে গভীর কাব্যবোধ। কবিতাও লিখতেন তিনি। মাধুর্যময় কথায়, সুরে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সংগীতও একসময় সমাদৃত হয়েছিল।

সংগীতের হেমেন্দ্রকুমার, নাটকের হেমেন্দ্রকুমার, চিত্রের ও নৃত্যের হেমেন্দ্রকুমার তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার খবর আমরা কতটুকু রাখিল সবই আজ রয়েছে আড়ালে, নতুন করে আবিষ্কারের অপেক্ষায়। তাঁর সাবালকপাঠ্য রচনাসম্ভার, সাবালক মন ও মননের রসদ জোগাতে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস— কিছুই আমরা মনে রাখিনি। এখন তিনি শুধুই বালকপাঠ্য, একান্তই ছোটোদের লেখক।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন একজন পূর্ণ-সময়ের লেখক। লেখাই ছিল তাঁর রুজিরোজগার। ছোটোদের জন্য লিখলে বুঝি রুজিরোজগারের পথটি সুগম হয়। তাই বড়োদের সাহিত্যের যে জগতে সদর্পে সগর্বে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেই চেনা-জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় নিজেই খানিক দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

ছোটোদের হেমেন্দ্রকুমারও বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। রহস্যময় গোয়েন্দা গল্পে, উত্তেজনাময় অ্যাডভেঞ্চারে মোটেই তিনি ঘুরপাক খাননি। দুঃখের বিষয় আমরা তাঁর ছোটোদের সাহিত্যেরও যথাযথ খবর রাখি না। যেটুকু জানি, তা একেবারেই খণ্ডিত, সমগ্র নয়। ‘ছোটোদের হাসিমুখ’ দেখতে চেয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। রকমারি গল্প লিখেছেন তিনি। তাঁর লেখা ইতিহাসকেন্দ্রিক গল্পগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। রহস্য-রোমাঞ্চময় গোয়েন্দা গল্পে হেমেন্দ্রকুমার রায় তো প্রবলভাবে সমাদৃত। অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে কাছে দূরে সর্বত্রই তাঁর পদচারণা। গল্প পড়তে পড়তে কখনো শ্রীহট্টের পাহাড়ে, কখনো বা পৌঁছে যাওয়া যায় সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলে। তাঁর গোয়েন্দা গল্প রহস্য-রোমাঞ্চের ঠাসবুনোটে সত্যিই অনবদ্য। ছোটোদের জন্য লিখেছেন তিনি, কিন্তু নিতান্তই ছোটোদের নয়। বয়স্কজনের কাছেও তা সমান উপভোগ্য। ‘ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প’-এর ভূমিকায় নিজেই লিখেছেন, ‘ছোটোদের উপযোগী করে লিখিত হলেও প্রাপ্তবয়স্কদেরও পক্ষে এগুলি অপাঠ্য হবে বলে মনে করি না। অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই আমি গল্প রচনা করি...।’ এই স্বীকারোক্তি তাঁর গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে সত্য।

‘যকের ধন’ দিয়ে যে পথ চলার শুরু, তা থেমে থাকেনি। প্রথমে পায়ে পায়ে পথ হাঁটা, ক্রমেই গতি বেড়েছে। ‘মৌচাক’-এর পঁচিশ বছর উপলক্ষে যে লেখাটি হেমেন্দ্রকুমার লিখেছিলেন, সেই লেখাটি শেষ হয়েছে এভাবে, ‘আগে ছিলুম আমি বড়োদের লেখক। ‘মৌচাক’ আমাকে দিনে দিনে বেশি মায়ার টানে টেনে এমনভাবে ছোটোদের প্রাণের কাছে এনে ফেলেছে যে, বড়োদের কথা ভাববার যথেষ্ট অবসর আর পাই না। ‘মৌচাক’ বদলে দিয়েছে আমার সাহিত্য জীবনের ধারা। এজন্যে আমি দুঃখিত নই।’ ছোটোদের আসরে যোগ দেওয়ামাত্র হেমেন্দ্রকুমার রায় জয় করেছিলেন ছোটোদের মন।

হেমেন্দ্রকুমারই তাঁর গোয়েন্দা গল্পে প্রথম ছোটোদের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, এভাবে আগে কেউ স্বীকৃতি দেননি। ছোটোদের তিনি ছোটো ভাবেননি। হেমেন্দ্র-আখ্যানে ছোটোদের বুদ্ধির বাহাদুরি আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা লক্ষ করি, তাদের বুদ্ধিতেই অপরাধীরা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে।

হেমেন্দ্রকুমারের গোয়েন্দা সাহিত্য ভিন্নতর। শুভবোধের বিচ্ছুরণ, মানবিকতা ও কর্তব্যবোধের প্রেরণাদায়ী নিদর্শন। 'দেড়শো খোকার কাণ্ড'-র গোবিন্দ চোর ধরার ইনাম পেয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। সে টাকা দিয়ে কী করবে, জনমদুঃখিনী মাকে 'একটি ভালো সেলাইয়ের কল আর একখানি দামী কাশ্মীরি শাল' কিনে দেবে। মা তো সবার উপরে, তাঁর জন্য কিছু করতে চায় সে। পুত্র হিসাবে তাকে আদর্শ করে তুলেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। একজন ছোটোদের লেখক অনেক বেশি 'কমিটেড'। এই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কখনো তিনি সরে দাঁড়াননি। গোয়েন্দা গল্প লিখতে বসেও এই দায়বদ্ধতার ব্যাপারে বরাবর সজাগ ছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমার বরাবরই ছোটোদের গুরুত্ব দিয়েছেন। ঘুরেফিরে ছোটোদেরই জয় ঘোষণা করেছেন। 'দেড়শো খোকার কাণ্ড'-এর গোবিন্দলাল বা 'যকের ধন'-এর 'বিমল' সাবালক নয়, লেখক জানিয়েছেন, 'বিমলের মতো চালাক ছেলে আমি আর দু'টি দেখিনি। তার গায়েও অসুরের মতন জোর, রোজ সে কুস্তি লড়ে দুশো ডন, তিনশো বৈঠক দেয়।' বয়স তার বেশি নয়, বি এ পরীক্ষার্থী। আরেক গোয়েন্দা হেমন্তও বয়সে তরুণ। জয়ন্ত সম্পর্কে এই একই কথা বলতে হয়। 'জয়ন্তের কীর্তি'তে হেমেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন, 'জয়ন্তের বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে নাতবে লম্বা-চওড়া চেহারার জন্যে বয়সের চাইতে তাকে অনেক বেশি বড় দেখায়।' হেমেন্দ্রকুমার রায়ই জানিয়েছেন, 'মানিকলাল বয়সে জয়ন্তের চেয়ে বছর দুই-এক ছোট হবে।' তারা সকলেই সাহসিকতায় অতুলনীয়। ঘরকুনো অপবাদ ঘুচিয়ে আনন্দ-উল্লাসে শামিল হয়েছে রহস্য-উন্মোচনে। তরুণজনের সবুজ-মনের দুঃসাহসিকতা-নির্ভীকতা পরাধীন দেশের নব প্রজন্মকেও উজ্জীবিত করেছিল। সীমাবদ্ধ অঙ্গনে আবদ্ধ বঙ্গসন্তান আবিষ্কার করেছিল নিজেকে। উজ্জীবন-মন্ত্রে, যে মন্ত্রের উদ্গাতা হেমেন্দ্রকুমার রায়, দীক্ষিত হয়েছিল বঙ্গের তরুণসমাজ। এই ভিন্নতর ব্যাপ্তির কথা তাঁর লেখা নতুন করে পড়তে গিয়ে আমাদের আবারও মনে হল। খুবই সমাদৃত হয়েছিল ওই চার চরিত্র। 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' উপন্যাসটিতে রয়েছে 'দু'-দুটো ভীষণ হত্যাকাণ্ড'-র কথা। না, হত্যাকারীর খোঁজ মেলেনি। ফলে জয়ন্ত-মানিকদের তৎপরতা বেড়েছে। উপন্যাসটির শুরুতে লেখক জানিয়েছেন, এই চারজন, এই 'সখের ডিটেকটিভ'রা কতখানি 'বাংলার ছেলেমেয়ে'দের কাছে সমাদৃত। উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনা হয়েছে এভাবে, 'সখের ডিটেকটিভ জয়ন্ত এবং বন্ধু মানিকলালের নাম-ডাক অল্প নয়। তাদের কৃতিত্বকাহিনী বাংলা মাসিকপত্রে কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। শুনতে পাই, বাংলার ছেলেমেয়েরা তাদের কথা শুনতে ভালোবাসে।' এই ভালোবাসা উত্তরোত্তর বেড়েছে।

'যকের ধন' প্রভূত জনপ্রিয় হওয়ার পর হেমেন্দ্রকুমার আর ফিরে যাননি বড়োদের জগতে। 'আবার যকের ধন', 'মানুষ পিশাচ', 'কিংকং', 'পঞ্চনদের তীরে', 'জেরিনার কণ্ঠহার', 'মেঘদূতের মর্তে আগমন', 'নীলসায়রের অচিনপুরে', 'মায়াকানন', 'কুমারের বাঘা গোয়েন্দা', 'শনি-মঙ্গলের রহস্য', 'সোনার আনারস', 'সাহাজানের ময়ূর', 'মৃত্যু মল্লার', 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন', 'অমৃত দ্বীপ'— এমন কত উপন্যাসই তো লিখেছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাসের নাম-তালিকা তৈরি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উল্লিখিত সব ক'টি উপন্যাসই যথারীতি রহস্যে-রোমাঞ্চে জমজমাট। সেই রহস্যজাল ছিন্নভিন্ন হয়েছে জয়ন্ত, মানিক, কুমার ও বিমলদের বুদ্ধির কৌশলে। রহস্যভেদের আনন্দে ভরে উঠেছে কিশোর-মন।

ছোটোদের সাহিত্যে জল-মেশানোর কারবার তো আজকের নয়, দীর্ঘদিনের। রবীন্দ্রনাথও একদা এই জল মেশানো নিয়ে দুঃখ করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমারের লেখায় জল নেই, আছে ছোটোদের জন্য নির্মল ভালোবাসা, রয়েছে তাদের বড়ো করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস। কোনও ফাঁক বা ফাঁকি নেই, কত গভীরভাবে ভেবেছেন, লিখেছেন, তা ফুটে উঠেছে পরবর্তীকালের এক লেখকের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায়। ধীরেন্দ্রলাল ধর তখন নিতান্তই তরুণ, সবে লিখছেন। প্রথম বইটি পড়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমার প্রথম বইটায় তুমি আফ্রিকার জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছ, ওটা সাহেবদের পক্ষে চলতে পারে। তারা সারা পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করছে, আমাদের তো সে সুযোগ নেই। আমাদের দেশের মধ্যেই তোমাকে অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে নিতে হবে, তাতে সারা দেশের সঙ্গে ছোটোরা পরিচিত হবে, দেশের কথাও জানবে। আর তার সঙ্গেই দেবে

দেশপ্রেম, ছোটোরা যেন এই দেশের মানুষ বলে গর্ব করতে পারে। তাতে তোমার লেখা ভালো হোক বা না হোক, যারা পড়বে তাদের চরিত্র ও আদর্শ তৈরি হবে। অ্যাডভেঞ্চার গল্পের উদ্দেশ্যই হল, দুঃসাহসী দৃঢ় চরিত্রের ছেলেমেয়ে গড়ে তোলা।' হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনাবলির দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় ধীরেন্দ্রলাল ধর এসব জানিয়েছিলেন। তাঁর এই মন্তব্য থেকে এটুকু অন্তত বোঝা যায়, একজন ছোটোদের লেখকের কতখানি দায় ও দায়িত্ব! সে-বিষয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়কে সচেতন থাকতে হত সতত। নব্য লেখকের উদ্দেশে শুধুই পরামর্শ জ্ঞাপন করেননি, এ সব প্রবলভাবে নিজেও পালন করেছেন। সুলভ অ্যাডভেঞ্চারের এখন বাড়বাড়ন্ত। ছাঁচে ফেলা গল্প লিখতেই অনেকে অভ্যস্ত। না আছে দায়বদ্ধতা, না আছে সচেতনতা। হেমেন্দ্রকুমারের লেখা একটু খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, কোথায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য, কেন তিনি ব্যতিক্রমী। তাঁর 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' নিয়ে আমাদের কম মুগ্ধতা নেই। বাল্য-কৈশোরে এ বই পড়ে কী ভালোই না লেগেছিল! ইংরেজি গল্প থেকে এই কাহিনির উৎস গ্রহণ করেছেন তিনি, অন্যত্রও রয়েছে বিলিতি গল্পের প্রভাব, এ কারণে কেউ যদি তাঁকে ততটা গুরুত্ব না দিতে চান, তবে বলা যেতে পারে অবনীন্দ্রনাথের কথা। অবিস্মরণীয় অবনীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখারই মূল উৎস তো দেশি-বিদেশি কোনো রচনা। হোক না বিদেশি গল্প, তা কতখানি এ দেশের, এ ভাষার উপযোগী হয়ে উঠেছে, তৈরি হয়েছে বাঙালিয়ানা, সে সবই তো বিবেচ্য! এ ব্যাপারে হেমেন্দ্রকুমার রায় আশ্চর্য সফল।

'দেড়শো খোকার কাণ্ড' উপন্যাসে সাহসিকতার যে আখ্যান হেমেন্দ্রকুমার শুনিয়েছেন, তা আমাদের সহজেই প্রাণিত করে। ভয়-ভীতি মুছে বালক-কিশোর মনেও সাহস সঞ্চারিত হয়। কিশোর-তরুণমনের এই দুঃসাহসিকতা-নির্ভীকতা পরাধীন দেশের নব প্রজন্মকেও হয়তো উজ্জীবিত করেছিল। গণ্ডিবদ্ধ জীবনে আবদ্ধ বঙ্গসন্তান মুক্তির উল্লাসে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে। আবিষ্কার করেছিল নিজেকে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে যে উজ্জীবন-মন্ত্র রয়ে যায়, তা বইয়ের পাতা থেকে ছড়িয়ে পড়ে মনে। এই বিস্তৃতির যে ভিন্নতর ব্যাপ্তি রয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অ্যাডভেঞ্চারের টানটান উত্তেজনার মধ্যেও হেমেন্দ্রকুমার জাগিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন শুভবোধ, কখনো দিয়েছেন নৈতিক শিক্ষা। 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' উপন্যাসে মায়ের প্রতি অন্তর উৎসারিত ভালোবাসার, কর্তব্যপরায়ণতার যে বর্ণনা আছে, তা ছোটোদের ছুঁয়ে যাবে, উদ্বুদ্ধ করবে। অ্যাডভেঞ্চার তো সন্ত্রস্ত করে না, ছোটোদের উজ্জীবিত করে, সাহসী করে তোলে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে, রহস্যময় গোয়েন্দা-কাহিনিতে রয়েছে গল্প জমানোর আশ্চর্য কৌশল। তাঁর দুঃসাধ্য সাধনের অ্যাডভেঞ্চারেও প্রায়শই রয়ে যায় রহস্যঘন গোয়েন্দা-কাহিনির আমেজ। ছোটোদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা ছিল। গল্প বলতেন চমৎকার। সহজভঙ্গি, বলার মধ্যে রয়েছে কথকতার মেজাজ। গোয়েন্দা সাহিত্যে অনেক সময়ই কল্পনার বাড়াবাড়ি থাকে। গোয়েন্দাটি কখনো বা অসীম ক্ষমতার অধিকারী, যা-খুশি-তাই করতে পারে। এমন কোনো অতিমানব সৃষ্টি করেননি হেমেন্দ্রকুমার। তাঁর চরিত্রগুলি বিশ্বাসযোগ্য। রক্ত-মাংসের মানুষ মনে হয়। কল্পনার ঘেরাটোপে নয়, বাস্তবের মাটিতে তাদের পা। এসব কারণেই হেমেন্দ্রকুমারের গোয়েন্দা কাহিনিতে ধুলো জমেনি। এখনো পঠিত হয়। কোথায় তাঁর সাফল্য, কীভাবে এসেছে সেই সাফল্য, বিশিষ্ট ছোটোদের লেখক ও 'রামধনু'-র সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য রচনাবলির পঞ্চম খণ্ডে সে-বিষয়ে জানিয়েছেন। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ লিখেছেন, 'কী করে রহস্যের পর রহস্যের জট পাকিয়ে গল্পকে এমন করে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় যে কিশোর-পাঠক এমন কৌতূহলী হয়ে উঠবে যে একবার পড়া শুরু করলে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শেষ-পৃষ্ঠা পর্যন্ত না গিয়ে থামতে পারবে না-সে কৌশল তাঁর জানা ছিল। এজন্য তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলো আজও পুরোনো হয়নি প্রথম যুগের পড়ুয়াদের ছেলেমেয়ে এবং পরে তাঁদেরও ছেলেমেয়ে অর্থাৎ তিন পুরুষ ধরে আজও তারা তা পরম আগ্রহে উপভোগ করে চলেছে।' সত্যজিৎ রায়ের আগে ছোটোদের সাহিত্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্য-কাহিনি লিখেই এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

ছোটোদের সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যে খ্যাতি তা গড়ে উঠেছিল মূলত 'মৌচাক'কে কেন্দ্র করে।

‘মৌচাক’-এর পঁচিশ বছর উপলক্ষে ‘আমার মৌচাক’ শিরোনামাঙ্কিত স্মৃতিকথা লিখেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। সে স্মৃতিকথায় আছে কোন প্রেক্ষাপটে, কীভাবে ‘যকের ধন’ রচিত হয়েছিল। এই অগ্রন্থিত রচনাটি থেকে জানা যায়, ‘মৌচাক’-সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারকে হেমেন্দ্রকুমার রায় বলেছিলেন, ‘অ্যাডভেঞ্চারের গল্প হচ্ছে বিলাতের ছোটদের সাহিত্যের একটি প্রধান অবলম্বন। আমার মনে হয়, এখানেও ছোটদের মহলে এরকম রচনার আদর কম হবে না। একবার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়?’

পত্রিকা-সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার সম্মতি জানিয়েছিলেন। হেমেন্দ্রকুমারও লিখে ফেলেছিলেন ‘যকের ধন’। উপন্যাসটি এতই সমাদৃত হয় যে, ‘তারপর মৌচাক-এ এই শ্রেণির রচনার প্রকাশই হয়ে উঠল একটি প্রধান বিশেষত্ব...।’ হেমেন্দ্রকুমারের লেখা থেকে জানা যায়, এ ধরনের লেখার ‘অসাধারণ জনপ্রিয়তা’ দেখে ‘বাংলাদেশের কত বিখ্যাত লেখক’-ই এমনতরো উপন্যাস লিখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কিশোর সাহিত্যের প্রথম সফল রোমাঞ্চ-কাহিনিকার হেমেন্দ্রকুমার রায় রোমাঞ্চকর জগতেই বার বার ফিরে ফিরে গিয়েছেন। ‘আবার যকের ধন’, ‘মেঘদূতের মর্তে আগমন’, ‘ময়নামতীর মায়াকানন’, ‘জয়ন্তর কীর্তি’, ‘নীলসায়রের অচিনপুরে’, ‘মায়াকানন’, ‘নৃমুণ্ড-শিকারী’, ‘রবিন হুড’, ‘সুন্দরবনের মানুষ বাঘ’, ‘মানুষ পিশাচ’, ‘জেরিনার কণ্ঠহার’, ‘কিং কং’, ‘পঞ্চনদীর তীরে’— ছোটোদের কথা ভেবে এমন কত বই না লিখেছেন তিনি! সংখ্যায় তা একশোরও বেশি। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অধিকাংশ উপন্যাসে রহস্য-জট যারা খুলেছে, তারা কেউই বয়সে নয়, পরিণত বুদ্ধিতে।

রোমাঞ্চকর কাহিনির পাশাপাশি ঐতিহাসিক কাহিনিতেও হেমেন্দ্রকুমার রায় সাফল্য পেয়েছেন। লিখেছেন অনেক ভূতের গল্পও। অবিশ্বাসের ভৌতিক জগৎ রচনাগুণে অন্তত সেই মুহূর্তের জন্য হলেও বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে, এটাই হেমেন্দ্রকুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য। লিখেছেন ‘তারা তিন বন্ধু’র মতো স্পর্শময় মানবিক উপন্যাস, কৌতুকরসসিক্ত গল্পও লিখেছেন বেশ কিছু। গল্প জমিয়ে তোলার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। যা ছোটোদের তো বটেই, অভিভূত করে রাখে বড়োদেরও। জয়ন্ত, মানিক, বিমল, কুমার, সুন্দরবাবুদের ভোলা যায় না। মনের অন্দরমহলে আপ্যায়ন করে আমরা তাদের বসতে দিয়েছি আরামকেদারায়।

সংখ্যায় কম হলেও ছোটোদের কথা ভেবে চমৎকার কিছু ছড়া-কবিতাও লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে প্রাণিত করতে পারে, দেখাতে পারে সঠিক পথ এমন লেখাও খুব কম নেই তাঁর রচনা-তালিকায়। আমরা একটি বইয়ের কথা বলতে পারি ‘আলো দিয়ে গেল যাঁরা।’ বানানো গল্পের সংগ্রহ নয়, ইতিহাসের পাতা থেকে ঘটনার পর ঘটনা উঠে এসেছে গল্পে গল্পে। ‘সাত হাজারের আত্মদান’, ‘মুসলমানের জহরব্রত’ বা ‘আলেকজান্ডারের পলায়ন’— প্রতিটি গল্পই আমাদের প্রাণিত করে, চলার পথটিকে আলোকিত করে তোলে। বিক্ষিপ্ত একটি বইতেই ছোটোদের প্রতি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা নয়। তাঁর সমগ্র শিশু-কিশোর সাহিত্যেই এই দায়বদ্ধতা কম-বেশি স্পষ্ট। কখনো তা জাহির করেননি, গোপনে লালন করেছেন, পালন করেছেন।

‘রংমশাল’ ছিল ছোটোদের এক ব্যতিক্রমী পত্রিকা। ছোটোদের পত্রিকাও যে কতখানি সমাজমনস্ক হতে পারে, সে নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে ‘রংমশাল’-এর পাতায় পাতায়। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল বারো বছর। হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদনা করেছিলেন দু’পর্বে। রবীন্দ্রনাথ ‘রংমশাল’-এ লিখেছেন। লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথও। সূচনা-সংখ্যা থেকেই শুরু হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমারের একটি অন্যরকম উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ। ‘অসম্ভবের দেশে’ নামে একটি সায়েন্স ফিকশন লিখতে শুরু করেছিলেন তিনি। ধারাবাহিকভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসও লিখেছেন। সে-উপন্যাসটির নাম ‘ভগবানের চাবুক’। রহস্য-গল্পের লেখক হিসাবে অধিক পরিচিত হেমেন্দ্রকুমার রায় ‘রংমশাল’-এর জন্য লিখেছিলেন রহস্য-নাট্য ’নিশীথ রাতের কাহিনী’। ছোটোদের পাতে ঝমঝমে ভূতের গল্প আদৌ দেওয়া উচিত কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়। ছেলেবেলায় অলৌকিক ভৌতিক কাহিনির প্রতি বিশ্বাস জন্মালে ক্ষতিই হয়। মনের অন্দরমহলে যে অর্থহীন অন্ধবিশ্বাস ডালপালা ছড়ায়, তা পরিণত বয়সেও রয়ে যায়। হেমেন্দ্রকুমার রায় ভূতের গল্প তো লিখেইছেন, গোয়েন্দা গল্পেও ভৌতিক-পরিবেশ তৈরি করেছেন, অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত আমরা ‘মানুষ পিশাচ’ বা

‘প্রেতাত্মার প্রতিশোধ’ উপন্যাস দু’টির কথা বলতে পারি। পড়তে পড়তে নিশ্চিতভাবে বালক-কিশোরমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

বাংলা ভাষায় বার্ষিকী প্রকাশের সূত্রপাত ‘পার্বণী’ দিয়ে। ঠাকুরবাড়ির জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘পার্বণী’, ১৩২৫-এ। আশুতোষ লাইব্রেরি ও দেব সাহিত্য কুটিরের পর ছোটোদের বার্ষিকী প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ‘শরৎ সাহিত্য ভবনে’র। ১৩৫২ তে ‘কলরব’ দিয়ে শুরু হয়েছিল ‘শরৎ সাহিত্য ভবনে’র বার্ষিকী-প্রকাশ। চলেছিল একটানা দশ বছর। বিভিন্ন নামে প্রকাশিত এই দশ বছরের বার্ষিকীই সম্পাদনা করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের আর্জিতে সাড়া দিয়ে ‘শরৎ সাহিত্য ভবনে’র বার্ষিকীতে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন। লিখেছেন সমকালের অধিকাংশ কবি-লেখক। সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায় অনেককে দিয়েই ভালো লেখা লিখিয়ে নিয়েছেন। ছোটোদের কথা ভেবে নিজেও লিখেছেন। শুধু স্বসম্পাদিত পত্রিকা বা বার্ষিকীতে নয়, সমকালের প্রায় সব ছোটোদের পত্রিকা ও সংকলনের তিনি ছিলেন অপরিহার্য লেখক। তাঁর রচনাবলির এ যাবৎ সাতাশটি খণ্ড বেরিয়েছে। বিস্তর লেখা এখনও অগ্রন্থিত রয়েছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ছোটোদের জন্য ছড়া-কবিতাও লিখেছেন। ‘শান্ত ছেলে’ নামের একটি কবিতায় শুনিয়েছিলেন এক বিচ্ছু ছেলের কথা। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে ‘দুড়ুম দাড়াম ঝন-ঝনা-ঝন। বাপরে এ কি ধুম ধাড়াক্কা,/কাঁপছে বাড়ি, ঝরছে বালি— বুকের ভিতর ঢেঁকির ধাক্কা।/ঐ যাঃ। বুঝি ভাঙলো শার্সি, /গুঁড়িয়ে গেল দেয়াল-আর্সি,/কে আছিসরে দেখরে গিয়ে ফাটল বুঝি মাথার খুলিল/শুনলুম শেষে হাবু বাবু খেলছেন ঘরে ডান্ডাগুলি।’ ছেলেটির দুরন্তপনা নিমেষে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তার হাতে তুলে দিতে হবে, ‘যকের ধন’ বা ‘জয়ন্তর কীর্তি’। একবার হেমেন্দ্রকুমারে ডুব দিলে সে আর টুঁ শব্দটি করবে না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ছোটোদের মহলে আজও হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভূত জনপ্রিয়। কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর তাঁর বিভিন্ন লেখা নিয়ে সংকলন প্রকাশের ধুম লেগেছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিপুল সৃষ্টিসম্ভার থেকে নির্বাচিত কিছু রচনা একত্রিত করে ছোটোদের জন্য একটি সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলাম অন্তত পঁচিশ বছর আগে। ‘সাহিত্য তীর্থ’ থেকে প্রকাশিত সে সংকলনটি বছর খানেকের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর ছাপা হয়নি। বইটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার প্রিয়জন, প্রকাশক-বন্ধু সন্দীপ নায়কের সঙ্গে একদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে এই বইটির কথা ওঠে। তিনি ছাপার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখুনি ছাপতে চান। বলামাত্র একটা ছেঁড়াখোঁড়া কপি কোনোরকমে জোগাড় করে তাঁর হাতে তুলে দিই। তিনি দ্রুত মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। ধন্যবাদ জানাই তাঁকে। পূর্বে প্রকাশিত সংকলনটি অদলবদল না করে অপরিবর্তিতভাবে মুদ্রিত হল।

এত বছর পর হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘কিশোর রচনা সম্ভার’ প্রকাশকালে বিশেষ করে মনে পড়ছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পুত্রবধূ শেফালী দেবীর কথা। বাগবাজারে গঙ্গার অদূরে তাঁদের বাড়িতে কতবার গিয়েছি। অনেক আনন্দময় সুখস্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। হেমেন্দ্রকুমারকে আমরা গোয়েন্দা গল্পের লেখক হিসেবে জানি। তাঁর বৈচিত্র্যময় রচনাসম্ভার ও সাহিত্যপ্রতিভার খবর রাখি না। এই সংকলনটিতে গোয়েন্দা-রচনার পাশাপাশি মানবিক রচনা, ভূতের গল্প, হাসির গল্প এককথায় সব ধরনের লেখা রয়েছে। রয়েছে কবিতা-ছড়া ও বেশ ক’টি প্রবন্ধ। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমারের সুসম্পর্ক ছিল। রয়েছে ঠাকুরবাড়ি নিয়ে তাঁর দু’টি লেখা। কিশোর-পাঠকের কথা মনে রেখেই এই সংকলন। ছোটোদের মহলে হেমেন্দ্রকুমার রায় আজও জনপ্রিয়, যথেষ্ট পঠিত হয়। আরও বেশি করে পড়ুক আজকের ছোটোরা। বড়োদের হেমেন্দ্রকুমার রায়ও পুনরাবিষ্কৃত হোক। বাঙালি-পাঠক হেমেন্দ্রকুমার রায়কে আরও বেশি করে চিনুক, বেশি করে জানুক।

জানুয়ারি ২০২৬ — পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

উপন্যাস

যকের ধন ১৩
তারা তিন বন্ধু ৮১

বড়ো গল্প

রহস্যের আলো-ছায়া ১১৭

ভৌতিক গল্প

এক-রাতের ইতিহাস ১২৯
কঙ্কাল-সারথি ১৩৫
ছায়া-কায়া-মায়া ১৪১
বিজয়ার প্রণাম ১৪৬
ভেলকির হুমকি ১৫১
শয়তান ১৫৪
ভূতের রাজা ১৫৯

রহস্য গল্প

গোয়েন্দা গল্প

অলৌকিক ১৬৬
চোরাই বাড়ি ১৭২
জয়ন্তের প্রথম মামলা ১৭৮
প্রাইভেট ডিটেকটিভ ১৮৮
জয়তু জয়ন্ত! ১৯৪

আমার গোয়েন্দাগিরি   ২০৩

ঐতিহাসিক গল্প

বর্গি এল দেশে   ২১১
ছত্রপতির অ্যাডভেঞ্চার   ২২০
ব্যাঘ্রভূমির বঙ্গবীর   ২২৬
মুসলমানের জহরব্রত ২২৯

অন্যান্য গল্প

একরত্তি মাটি   ২২৩
বনবাদাড়ে ২৪০
খুড়োর খামখেয়াল ২৪৪
গুপ্তধন   ২৫২
বাহাদুরের নির্বাসন ২৫৭

ছড়া, প্রবন্ধ ও অন্যান্য

শান্ত ছেলে   ২৬১
এক যে   ২৬৩
শীত   ২৬৪
শখের গোয়েন্দা স্যার কোনান ডয়েল   ২৬৫
নূতন বাংলার প্রথম কবি   ২৬৮
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি   ২৭৪
গগনেন্দ্রনাথ   ২৭৭
অবনীন্দ্রনাথের গল্প   ২৮০
গ্রন্থপঞ্জি   ২৮৪

যকের ধন

এক

মড়ার মাথা

ঠাকুরদাদা মারা গেলে পর, তাঁর লোহার সিন্দুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি ছোটো বাক্স পাওয়া গেল। সে বাক্সের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও দামি জিনিস আছে মনে করে মা সেটি খুলে ফেললেন। কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া গেল শুধু একখানা পুরোনো পকেট-বুক, আর একখানা ময়লা-কাগজে-মোড়া কী একটা জিনিস। মা কাগজটা খুলেই জিনিসটা ফেলে দিয়ে হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কী, কী হল মা?'

মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'কুমার, শিগ্‌গির ওটা ফেলে দে!'

আমি হেঁট হয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা মড়ার মাথার খুলি মাটির উপরে পড়ে রয়েছে! আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'লোহার সিন্দুকে মড়ার মাথা! ঠাকুরদা কি বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?'

মা বললেন, 'ওটা ফেলে দিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করবি চল!'

মড়ার মাথার খুলিটা জানলা গলিয়ে আমি বাড়ির পাশের একটা খানায় ফেলে দিলুম। পকেট-বুকখানা ঘরের একটা তাকের উপর তুলে রাখলুম। মা বাক্সটা আবার সিন্দুকে রাখলেন।

দিন কয়েক পরে পাড়ার করালী মুখুয্যে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। করালী মুখুয্যেকে আমাদের বাড়িতে দেখে আমি ভারি অবাক হয়ে গেলুম। কারণ আমি জানতুম যে ঠাকুরদাদার সঙ্গে তাঁর একটুও বনিবনা ছিল না, তিনি বেঁচে থাকতে করালীকে কখনো আমাদের বাড়িতে দেখিনি।

করালীবাবু বললেন, 'কুমার, তোমার মাথার ওপরে এখন আর কোনও অভিভাবক নেই। তুমি নাবালক। হাজার হোক তুমি তো আমাদেরই পাড়ার ছেলে। এখন আমাদের সকলেরই উচিত, তোমাকে সাহায্য করা। তাই আমি এসেচি।'

করালীবাবুর কথা শুনে বুঝলুম, তাঁকে আমি যতটা খারাপ লোক বলে ভাবতুম, আসলে তিনি ততটা খারাপ লোক নন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'যদি কখনো দরকার হয়, আমি আপনার কাছে আগে যাব।'

করালীবাবু বসে বসে একথা সেকথা কইতে লাগলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁকে বললুম, ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকে একটা ভারি মজার জিনিস পাওয়া গেছে।'

করালীবাবু বললেন, 'কী জিনিস?'

আমি বললুম, 'একটা চন্দনকাঠের বাক্সের ভেতরে ছিল একটা মড়ার মাথার খুলি—'

করালীবাবুর চোখ দুটো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'মড়ার মাথার খুলি?'

হ্যাঁ, আর একখানা পকেট-বই।'

'সে বাক্সটা এখন কোথায়?'

'লোহার সিন্দুকেই আছে।'

করালীবাবু তখনই সেকথা চাপা দিয়ে অন্য কথা কইতে লাগলেন। কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম, তিনি যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। খানিক পরে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম আমার কুকুর বাঘা ভয়ানক চিৎকার করছে। বিরক্ত হয়ে দু'-চারবার ধমক দিলুম, কিন্তু আমার সাড়া পেয়ে বাঘার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠল, সে আরও জোরে চ্যাঁচাতে লাগল।

তার পরেই, যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে যেন দুড়-দুড় করে ছাদের উপর দিয়ে চলে গেল। ব্যস্ত